ই-৯ সম্মেলন : শিক্ষা পেশায় দক্ষ জনশক্তি প্রসঙ্গ

ড. মিহির কুমার রায়

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঢাকাস্থ ই-৯ মিনিস্ট্রিয়াল মিটিং অন এডুকেশন-২০৩০ শীর্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথীর ভাষণে শিক্ষা পেশার জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পাশাপাশি করণীয় নির্ধারণে ই-৯ ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্র, যেমন বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ইত্যাদির প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন- এসডিজি- ৪ এর মূল লক্ষ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসার। এসব বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষা মনে রেখে সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষাবিদ ও নীতি নির্ধারকরা এডিজি-৪ এডুকেশন ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে নিজ নিজ দেশের আকাঙ্ক্ষার অঙ্গীকার ও প্রাধিকারের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন এবং এই নয়টি দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলন ৫ই ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ৭ই ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ই-৯ এর জন্ম ১৯৯৩ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এবং ই-৯ এ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা অধ্যুষিত নয়টি উন্নয়নশীল দেশ দেশের সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্যসমূহ নিয়ে কাজ করছে। আবার এসব দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্য সামনে রেখে টেকসই উন্নযনের জন্য নতুন বৈশ্বিক এডুকেশন ২০৩০, এজেন্ডা প্রেক্ষাপটে ই-৯ উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার একটি সাধারণ প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। এই সম্মেলনে ই-৯ এর নতুন চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী। আমরা যদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বিচার বিবেচনা করি তা হলে দেখা যায় যে, দেশটি বেশির ভাগ এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমর্থ হয়েছে, যার মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জন ও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও বাংলাদেশ ২০১০ সালে অংশগ্রহণমূলক এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে কিছু কৌশল-উপবৃত্তি কর্মসূচির, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠী, অনগ্রসরদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যক্তি খাত / বেসরকারি খাতে সুবিধা নিশ্চিত করতে বৃত্তি কর্মসূচির সম্প্রসারণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ, জীবনমুখী শিক্ষা/সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সার্বজনীনতা নিশ্চিতকরণ।

তাছাড়াও উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতি যেমন শিখন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়াস/প্রয়োগ, ইন্টারেক্টিভ ক্লাস, উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ইত্যাদি শিক্ষানীতির অংশবিশেষ। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনীমূলক ভাষণ ও এস.ডি.জি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি আমাদেরকে সামনে চলার পথে অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত। তারপর রূপকল্প ২০২১কে সামনে রেখে দেশের শিক্ষার হার শতভাগ উন্নতি করার কথা রয়েছে কারণ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম যা জীবনের সর্বস্তরের বিষয়াবলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যেমন: নৈতিক বোধ সৃষ্টিতে, জীবন জগতকে জাগ্রত করতে ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে। একজন শিক্ষক বিশেষজ্ঞ বলেছেন- 'কেহ যদি সম্পদের মালিক হয় তবে তা রক্ষা করতে বাড়তি জনবলের প্রয়োজন হয়। আর যদি জ্ঞানের অধিকারী হয় তবে সেই জ্ঞানই তার জন্য রক্ষা কবচ যা অর্জিত হয় সু-শিক্ষার মাধ্যমে। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শতভাগ শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে প্রতি বছর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য মতে নব্বই এর দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশু ছিল ৬১ শতাংশ যা বর্তমানে উন্নীত হয়েছে প্রায় ৯৮ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের কাছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি পাথেয় হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বোর্ডগুলো যে চার স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে যা শিক্ষা বিস্তারে এক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে যা বর্তমানে শিক্ষার হার শতকরা ৭২ ভাগ বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক। আবার বেসরকারি পর্যায়ে সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য গণমুখী শিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যাপক বিস্তৃতি শিক্ষার হার বাড়ানোর অন্যতম প্রধান কারণ। এখন সময় এসেছে শিক্ষার মান বাড়ানোর বিশেষত একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়। এরি মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি) উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'হেকাপ' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং দেশের পাবলিক প্রাইভেট মিলে প্রায় ১৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় এর সুফল ভোগীর তালিকায় রয়েছে। তাছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। তারপরও এখন সময় এসেছে শিক্ষার মান উন্নয়নের এর জন্য প্রয়োজন প্রথমত: ই-৯ ফোরামকে কাজে লাগানো যা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে ইঙ্গিত করেছেন বার বার বিশেষত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি।

এখন প্রশ্ন হলো সেটি কিভাবে সম্ভব এবং একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে ই-৯ ফোরামভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষক বিনিময় কিংবা শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিনিময়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দ বুঝতে পারবে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য রোড ম্যাপ কি হতে পারে এবং এর সফল বাস্তবায়ন কিভাবে হবে? শিক্ষার মান উন্নয়ন যেহেতু প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত তাই একদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর) ও অপরদিক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। এখানে উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত সম্মেলনে ই-৯ এর চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যার মাধ্যমে একটি বাড়তি সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে যা কাজে লাগাতে হবে; দ্বিতীয়ত, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সারাদেশে প্রতিষ্ঠানিকভাবে একাধিক কাঠামো কাজ করে চলছে। তার মধ্যে রয়েছে প্রথাগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রয়োগ। এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দিকটিতে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রসার ঘটেছে সর্ব পর্যায়ে কিন্তু দক্ষ শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত, অবকাঠামোগত অভাব বিদ্যমান যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক ল্যাব, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম, শব্দ দোষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু তার পাশাপাশি বক্তৃতা পদ্ধতি এখনও একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে যার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করছে শিক্ষকের শব্দ চয়ন, বাচন ভঙ্গী, বস্তুনিষ্ঠতা ও সময়ানুভর্তিতা যা একটি ছাত্রের মনোজগতকে অনায়াসেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়; তৃতীয়ত: দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এই পেশাটিতে এখন আর কেহ আগ্রহী নয় এবং এর কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই শিক্ষা সেবাতে সুযোগ সুবিধা কম, নৈতিক ভিত্তির জায়গাটিতে বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ ও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের সনাতন গতিধারায় আধুনিকতা ইত্যাদি। এর একটি বড় বিষয় পাঠ্যসূচিগুলোতে হিউমিনিটিস এর বিষয়গুলো যেমন ইতিহাস, দর্শন, বাংলা, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, যুক্তি শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির একেবারেই নেই বিশেষত: দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজা অগণিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। আর সরকারি প্রথামতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সকল অনুষদের জন্য এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোন কমন সিলেবাস নেই। আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যা দেয়া হয় তা অনেকাংশে বিক্রিত যা শক্তিশালী ভিত্তি গঠনের সহায়ক নয় অর্থাৎ শুরু থেকেই যখন একজন ছাত্র বিভ্রান্তিতে উপনীত হয় তখন সেগুলো দূর করতে অনেক সময় চলে যাবে। এমন দেশের সঠিক ইতিহাসটি কি তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করে রাজনীতির মানদণ্ড নয় নৈতিকতা তথা জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার হওয়া উচিত; চতুর্থত: শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে আইনগত কাঠামোর ভেতর থেকেও অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব যদি প্রতিষ্ঠান প্রধান (প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপচার্য্য) উদ্যোগী হন যার অনেক সফলতার কাহিনী আমরা পত্র পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। তার সাথে আরও দুটি বিষয়ের সংযোজন প্রয়োজন তা হলো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ঐকান্তিক সহযোগিতা। ভালো শিক্ষক ছাড়া যেমন ভাল শিক্ষার্থী তৈরি হয় না একইভাবে এই প্রক্রিয়ায় যদি অভিভাবক শিক্ষার্থীর নিযমিত তদারকীতে না থাকে তবে কেবল অর্থ সহায়তাই ভালো শিক্ষার্থী সৃষ্টি হবে না। প্রায়শই শোনা যায় যে, কি মানের শিক্ষা গ্রহণ করছে তার সন্তান? শিক্ষা কি জ্ঞান নির্ভর না সনদ নির্ভর? চাকরির বাজারে তারা টিকে থাকতে পারছে না কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অতি সহজ- কেবল মান সম্মত শিক্ষাই এই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য সহায়ক শক্তি; চতুর্থত: শিক্ষার উন্নয়নে সরকার আন্তরিক হলেও এই শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সংস্থা ততটা আন্তরিক বলে মনে হয় না। তার প্রমাণ পহেলা জানুয়ারিতে দেশের অগ্রনীতি শিক্ষার্থীর হাতে যে বিনামূল্যে পুস্তক তুলে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অসংখ্য ভুল, তথ্য বিভ্রাট, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কথা-বার্তা যা সরকারের সুনাম ও দক্ষতাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করে। তার অর্থ সরকারি যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপশক্তির পাঁয়তারা এখনও দৃশ্যমান যা সরকারকে বুঝতে হবে এবং প্রকার ভেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বিশেষত উন্নয়নখাত যেমন পাঠ্যবই প্রকাশনার দায়িত্ব এন.সি.টি.ভির কর্তৃপক্ষের এবং এই সংস্থাটি কেন উদাসীন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন পাবলিক ও নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্র ছাপানো, ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি পরীক্ষা, পাঠ্যবই রচনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উপর বিভিন্ন কমিটি কাজ করে থাকে এবং কমিটি গঠনের পূর্বে সভার মাধ্যমে পরিকল্পনা পত্র তৈরি হয়ে থাকে কিন্তু মূল সমস্যাটি বাস্তবায়নের। তাই সকল স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার মতো বিষয়াদি একটি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত, মাফিক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অপরদিকে কারিগরি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়াদি অন্য একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। আবার সদ্য বিভাজিত নতুন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাদ্রাসা কার্যক্রমকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যাস্ত করা যেতে পারে; পঞ্চমত: শিক্ষার বাজেট নিয়ে সংসদে সব সময়ই জোরালো আলোচনা হয় বিশেষত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বাজেট নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একেবারেই বাজেট বরাদ্দ কম আবার যাও আছে তা আবার সঠিক সময়ে অব্যহৃত থাকে যা প্রতিষ্ঠানিক অক্ষমতার আরও একটি নজির যার সঙ্গে শিক্ষার মানের বিষয়টি জড়িত। তাই শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড তবে এ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করছি ই-৯ সম্মেলনের কার্যক্রম আমাদের এ অঞ্চলের শিক্ষার মানোন্নয়নে অবদান রাখবে।

[লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ]